মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন

(সাহাবিযুগ থেকে মোগল আমল)

মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী

অনুবাদ : ওমর ফারুক ফেরদৌস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

॥ সূচিপত্র ॥

ভূমিকা ॥ **১৩**

মুসলিম বিশ্বে ফিতনার সূচনা ॥ **২০**

মুনাফিকদের ধারাবাহিক চক্রান্ত ॥ ২৮

গোপন কার্যক্রম এবং দিওয়ানির রেশ ॥ **৩২**

মুসলমানদের মধ্যে বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ॥ ৩২

জাল হাদিসের সূত্রপাত ॥ ৩৫

আলাবিদের উদ্যোগ ও ব্যর্থতা ॥ ৩৫

আব্বাসিদের গোপন কার্যক্রম ॥ ৩৭

ঘটনাপ্রবাহ আব্বাসিদের পক্ষে ॥ ৩৯

ইরানি ও খোরাসানিদের চক্রান্তের সফলতা ॥ ৪১

আলাবিদের বঞ্চিত রেখে আব্বাসিদের ক্ষমতায়ন ॥ ৪৩

গোপন চক্রান্ত এবং ইসলাম ॥ ৪৬

বনু উমাইয়ার খিলাফতকালে ফেরকাসমূহ ॥ **৪৯**

ইসলামের প্রথম শতক ॥ ৪৯

প্রথম যুগের ফেরকা ॥ ৫১

আব্বাসি খিলাফতের প্রথম একশত বছর ॥ **৬০**

আব্বাসিদের বিরুদ্ধে আলাবিদের আন্দোলন ॥ ৬০

আবদুল্লাহ সাফফা ও মনসুর আব্বাসির প্রস্তুতি ॥ ৬২

আব্বাসিদের বিরুদ্ধে আলাবিদের বিদ্রোহ ॥ ৬৫

অগ্নিপূজারি ও ধর্মবিরোধীদের বিদ্রোহ; আব্বাসীয়দের সতর্কতা ॥ ৬৭

আলাবিদের বিদ্রোহ ও ব্যর্থতা ॥ ৬৯

খারেজি ও অগ্নিপূজারিদের বিদ্রোহ এবং বারমাক পরিবারের ধ্বংস ॥ ৭১

আবারও আলাবিদের বিদ্রোহ ॥ ৭৪

ইরানি ও আলাবিদের বিদ্রোহ ॥ ৭৫

আব্বাসীয়দের তুর্কিপ্রীতি ॥ ৭৬

তুর্কিদের হাতে আরবরা লাঞ্ছিত ॥ ৭৮
শতাব্দীর ফেরকাগুলো ॥ ৭৯
দ্বিতীয় শতকে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা ॥ ৮৫
হিজরি পঞ্চম শতক পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত অবস্থা ॥ ৯৬
শাহি দরবারে আকিদাগত টানাপোড়েন ॥ ৯৬
আলাবিদের বিদ্রোহ; খিলাফতে আব্বাসিয়া ॥ ৯৭
জঙ্গিদের ফিতনা ॥ ৯৮
আলাবিদের বিদ্রোহ ॥ ৯৯
কারামাতার নতুন মতবাদ ও কয়েকটি নতুন শাসন ॥ ৯৯
কারামাতিদের জুলুম এবং কাবার অসম্মান ॥ ১০১
দায়লামিদের দাপট; আব্বাসি খলিফাদের অসারতা ॥ ১০২
বাগদাদে শিয়া শাসন ॥ ১০৩
আশুরায়ে মহররম ও তাজিয়ার প্রচলন ॥ ১০৪
শাম ও মিশরে শিয়া শাসন ॥ ১০৫
শিয়াদের শাসনের উত্থান ॥ ১০৫
দায়লামিদের পতন এবং সেলজুকদের উত্থান ॥ ১০৭
তাবসেরা ॥ ১০৯
একনজরে মাজহাবি অবস্থা ॥ ১১২
চার মাজহাব প্রচলন এবং ইজতিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণ ॥ ১১৩
ভারতে ইসলাম ॥ ১২৭
ভারতে আফগানদের আগমন ও ইসলামের দাওয়াত ॥ ১২৭
ভারতে ইসলামি সালতানাতের সূচনা এবং ইসলাম প্রচারকদের স্বল্পতা ॥ ১২৯
মুসলিম সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ; মোগলদের মুসলিম নিধন ॥ ১৩০
খিলাফতের ধ্বংস এবং ভারতে ইরানি-খোরাসানি মুসলমানদের আগমন ॥ ১৩২
ভারতে সুফিদের আগমন ॥ ১৩৩
হিজরি অষ্টম শতকে ভারতে ইসলামের প্রসার ও পরিসর ॥ ১৩৫
সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলক এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ॥ ১৩৭
কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে বিদআতি মুসলমানদের ॥ ১৩৮

বিদ্রোহ
কাবায় চারটি জামাত হওয়ার সূচনা ॥ ১৩৯
দশম শতকের সূচনা ॥ ১৪১
কবির ও নানকের নতুন ফেরকা ॥ ১৪২
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরি ও শাইখ আলায়ির ॥ ১৪৩
কুরআন-সুন্নাহর প্রসার
শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব ॥ ১৪৪
আকবরের যুগে ইসলাম ॥ ১৪৪
শাহি দরবারের ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী আইন চালু ॥ ১৪৫
দাক্ষিণাত্যে শিয়া প্রভাব ও শাহ তাহের ॥ ১৪৬
মুজাদ্দিদ সাহেব এবং সমসাময়িক অন্যান্য আলিম ॥ ১৪৮
মোগল দরবারের ইসলামবিরোধী প্রভাব ॥ ১৪৮
আলমগিরের সংস্কার প্রয়াস ॥ ১৪৯
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) ॥ ১৫০
অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডে শিয়া-সুন্নি যুদ্ধ ॥ ১৫১
তেরো শতকে ইসলামের মুজাহিদরা ॥ ১৫২
বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৫৩
কিছু জরুরি কথা **১৫৫**

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। তাঁর ওপরই ভরসা করি। নিজেদের মন্দ কাজ থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর বংশধরের ওপর এবং সমস্ত সাহাবি ও সালেহিনের ওপর।

কয়েক যুগ ধরে মুসলমানদের ব্যাপারে এই প্রশ্নটি সামনে আসছে, দিনদিন মুসলমান জাতির সিফাতে মাহমুদা তথা প্রশংসনীয় গুণাবলিগুলোর অবক্ষয় ঘটছে এবং সিফাতে মাজমুমা তথা নিন্দনীয় গুণাবলি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্য কথায়, সমস্ত ভালো কাজ যেমন : রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, অর্থসম্পদ, মান-সম্মান, নীতি-নৈতিকতা, আদব-আখলাক ইত্যাদি ছেড়ে দিচ্ছে মুসলমানরা। আর সমস্ত খারাপ কাজ যেমন : দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, খারাপ অভ্যাসসহ নতুন নতুন অপকর্মের জন্ম দিচ্ছে এবং এর বিকাশ ঘটাচ্ছে। এগুলো এমন গর্হিত কাজ, যা একটি জাতিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

মুসলিম জাতির কেন এমন হলো? এর কারণ কী? কীভাবে তাদের অতীতের গুণাবলিকে বর্তমানের জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায়? প্রায় ৫০ বছর ধরে এই অপরিহার্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ইসলামি সভা-সম্মেলন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর দু-চারটি ছোটো-বড়ো বইও এই প্রশ্নের জবাবে প্রকাশিত হয়েছে।

মাসিক ইসলামি পত্রিকা, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইসলামি দৈনিক পত্রিকা এবং জামে মসজিদের সাপ্তাহিক খুতবাতেও একই প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

যাত্রাকালীন সফরেও মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়—মুসলমানগণ এমন হলো কেন? এই ৫০ বছরে উপরিউক্ত বিষয়ের ওপর যা কিছু লেখা ও বলা হয়েছে, সবই যদি বই আকারে লেখে সুবিন্যস্ত করা হয়, আমার মনে হয় ছোটোখাটো একটি পাঠাগার তৈরি হয়ে যাবে।

যার মধ্যে শতাধিক নেতৃত্বশীল ব্যক্তি, শত শত আলিম, লেখক, কবি এবং লক্ষাধিক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানের চিন্তাচেতনা ও প্রবন্ধ পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক জ্ঞান ইত্যাদির প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। যখন এই

জরুরি প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ রোগের কারণের লক্ষণ ও চিকিৎসা জানতে এত বড়ো প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তখন কেন এই শৃঙ্খল শেষ হয় না? কেন আগের চেয়ে বেশি মানুষ আকৃষ্ট হয়?

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো—চোর এখনও ধরা পড়েনি এবং রোগটি এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলকথা হচ্ছে, মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যাণ নিয়ে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা ও লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশই নিরর্থক।

বিভিন্ন শিরোনামে নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা উল্লেখ করা হলো।

এক. মুসলমানগণ শিল্প ও বাণিজ্য অগ্রাহ্য করে দারিদ্র্য ও অনৈতিকতায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের উচিত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

দুই. মুসলমানগণ পড়ালেখা ও জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট মনোযোগী নয়। অন্যান্য জাতির সাথে অ্যাকাডেমিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে তারা মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাই কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষাকে প্রথমে অগ্রাধিকার দেওয়া।

তিন. মুসলমানদের মধ্যে অনর্থক ব্যয় ও অপচয় অনেক বেড়ে গেছে এবং সমস্ত সম্পত্তি অবিক্রিত হয়ে পড়েছে এবং তারা সেগুলোকে সাশ্রয়ী করতে চায়।

এই ধরনের জিনিসগুলো যতই উত্তম ও প্রয়োজনীয় হোক না কেন, তাদের মধ্যে বাস্তবতা নেই। যেমন : ১৫০ বছর আগে এ দেশে কাপড় বুনন, ছুতোর শিল্প, ধাতুর কাজ, রাজমিস্ত্রি, জুতো তৈরি, সেলাই কাজ, সূচিশিল্প, তিরন্দাজ, অস্ত্রশিল্প ক্যালিওগ্রাফি তৈরিসহ হরেক রকমের শিল্পই মুসলিমদের হাতে ছিল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসে লবণ, মরিচ ইত্যাদি বিক্রির সাধারণ ব্যাবসা করেছিলেন মুসলমানরা। এ ছাড়াও বড়ো বড়ো ব্যাবসা-বাণিজ্য তাদের অধীনে ছিল। তা ছাড়া এমনিতেই তারা ছিল প্রচুর সম্পদের অধিকারী। ব্যাবসা-বাণিজ্য এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তাদের পণ্যগুলো শহর থেকে শহরে এবং দেশ-দেশান্তরে পরিবহন করা হতো।

শুধু ব্যাবসা-বাণিজ্যেই নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানেও অন্য জাত ও ধর্মের ওপর ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। বড়ো বড়ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বেও মুসলমানদের মধ্যে অপব্যয় একই রকম ছিল। এজন্য এগুলোকে রোগের অনুষঙ্গ বলা যেতে পারে; কিন্তু এগুলোর কোনোটিকেই প্রকৃত রোগ বলা যাবে না।

দীর্ঘ চিন্তাভাবনা করার পর বিশ্লেষকগণ বলেছেন, প্রকৃত রোগ হচ্ছে ধর্মহীন সরকার এবং মুসলমানদের পরাধীনতা।

যারা এমনটি বলেছেন, তারা অবশ্যই অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং যৌক্তিক বিচারে সঠিক। আর এসব বক্তব্য খণ্ডন করাও সম্ভব নয়। তবে তাদের রোগ নির্ণয় সঠিক বলে মেনে নেওয়ার পরও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আজ পর্যন্ত তারা রোগের সঠিক চিকিৎসা বাতলে দিতে পারেননি।

ভিনদেশি বা অধর্মীয় সরকারকে অপসারণ ও বিতাড়িত করতে এখন পর্যন্ত যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে এবং যেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, তার একটিও সফল হয়নি। সবচেয়ে মজার কথা

হলো, হিন্দু-মুসলমান সকলেই বিদেশি সরকারের ক্ষমতা থেকে রেহাই চায়; কিন্তু নিজেরা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ধারণা করা হয়েছে, একটি বিদেশি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটিও হবে অধর্মীয় অর্থাৎ অনৈসলামিক কিংবা বড়োজোর আধা ইসলামিক। এই আধা ইসলামিক দেশে মুসলমানরা নিজেদের সামলাতে পারবে, তাদের গৌরবময় দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং তাদের হারানো সম্মান, সম্পদ ও শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাষ্ট্রপরিচালনা ও রাজত্বের জন্য কিছু শর্ত বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক জাতি এই শর্তগুলো পূরণ করার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাওয়ার যোগ্য হয়। এমন কিছু ভুল রয়েছে, যেগুলো অধিক পরিমাণে হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা রাজত্ব কেড়ে নেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মানুষের জীবন-মৃত্যুর কারণ ও আলামত ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআনের সকল শিক্ষা ও তার বর্ণিত নীতিমালা কখনোই ভুল প্রমাণিত হয়নি। আর এগুলোর বৈধতা ও যথার্থতার প্রমাণ প্রত্যেক যুগেই পাওয়া গেছে।

পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের মাপকাঠি অনুযায়ী প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মুসলমান ছিলেন। সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাষ্ট্র ও রাজ্যের মালিক ছিলেন তাঁরা। সাহাবায়ে কেরামের পর মুসলমানরা যত দুর্বল হয়েছে, তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তত দুর্বল ছিল। ১৩৫০ শত বছরের ইতিহাসের প্রতিটি মুহূর্তই এর প্রমাণ বহন করে।

ইসলাম এবং আল্লাহর কালামকে অবহেলা করে কোনো যুগেই মুসলমানদের সফল হওয়ার নজির নেই।

এই বাস্তবতার পরও মুসলমানগণ তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু কুরআনের দিকে ফিরে আসছে না। পবিত্র কুরআন থেকে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে বের না করাটা খুবই বিস্ময়কর!

মুসলিম জাতির রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এরচেয়ে ভালো কোনো গবেষণা হয়নি। এই রোগের একমাত্র সঠিক চিকিৎসা আমার অন্য একটি পুস্তিকা *আকাবিরে কওম*-এর পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আদর্শ গুণাবলি অর্জনের মূল হাতিয়ার ইসলামের ওপর অবিচল থাকা এবং কুরআনকে নিজের জীবনের ভিত্তি বানানো।

এই বিষয়গুলো তো নতুন নয়; বরং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আসছে অনেক আগে থেকেই। মুসলমানরা শুনেছে ও অধ্যয়ন করেছে। আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় হলো, মুসলমানদের মধ্যে এসব কথার কোনো গুরুত্বই নেই; নেই অনুসরণের তৎপরতাও।

আমি এই বইটি কেন লিখলাম

আমি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলাম, মুসলমানগণ কেন পবিত্র কুরআন, সহিহ ও প্রতিষ্ঠিত হাদিসগুলোর প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না? তখন আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম।

এক.

মুসলমানদের মধ্যে সেই সময় পর্যন্ত ইতিহাস ও মাজহাব সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় ছিল। একটি বিষয় ছিল আরেকটি থেকে পৃথক ও অপরিচিত।

তারা ইতিহাস পড়ার সময় খলিফা ও সুলতানদের যুদ্ধ ও সংঘাত দেখে। দরবার ও দরবারের কার্যকলাপ পড়ে। তখন কুরআন-হাদিসের বিধিমালা, সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনযাপন, বিদআত ও তার কুফল ইত্যাদির দিকে ভুলেও তাদের দৃষ্টি পড়ে না।

বিপরীতে যখন তারা মাজহাবের বইপত্র অধ্যয়ন করে এবং ফিকহি মতানৈক্য, উলামায়ে কেরামের পর্যালোচনা, ইমামদের ইজতিহাদ ইত্যাদি পড়ে, তখন খলিফা ও সুলতানদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি বেমালুম থাকে।

এ বিষয়টি কারও মাথায় আসে না, আমি যে আলিম, ইমামের বা সুফির বক্তব্য ও কার্যাবলি অধ্যয়ন করছি, সে কোন শহরের মানুষ ছিল? কোন সময়ের ছিল? কার শাসনামলে ছিল? রাষ্ট্রপ্রধানের দরবারের সাথে তার কেমন সম্পর্ক ছিল? ওই সময়ের অন্যান্য আলিমের অবস্থা কেমন ছিল? কোন বইটি কোন সময়ে এবং কোন পরিস্থিতিতে রচিত হয়েছিল?

সুলতানের প্রভাব জনসাধারণের ইবাদত ও আমলসমূহে এবং তাদের আকিদাতে কেমন ছিল? কে কোন প্রথার প্রচলন করেন? কোন বিদআত কার সময়ে কতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল? এমনকি সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ইসলাম প্রতিনিয়ত কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাও জানা নেই।

ফলে যাদের পণ্ডিত বলা হয়, তাদের মনেও ইসলামের শিক্ষার সঠিক রূপরেখা প্রায়শই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে এবং মানুষকে ইসলামের সাথে পরিচিত করতে ব্যর্থ হয়। ধর্ম, আমল ও বিশ্বাসের সংস্কারের ব্যাপারেও ইতিহাস যে কাজ করতে পারে, তা অনুমান করা যায় কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে। এগুলোতেই রয়েছে আমাদের জন্য অনন্য শিক্ষা।

পরিপূর্ণ ইতিহাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানগণ উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে না। ফলে মুসলমানদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে হবে। বিদআতে সাইয়িয়া ও কুসংস্কারের সঠিক ইতিহাস এবং এর খারাপ পরিণতি সম্পর্কে বলতে হবে। এতে করে পরিপূর্ণভাবে সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে।

দুই.

শুরু থেকে এ দেশে আরবি ভাষার চর্চা অতি ক্ষুদ্র একটি শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কুরআনকে বুঝতে অসংখ্য উর্দু অনুবাদের বই থাকলেও মানসম্মত ও বিশুদ্ধ অনুবাদ খুবই সীমিত। তাই কুরআনের অনুবাদ থেকে মুসলমানদের যেমন উপকার হাসিল করার দরকার ছিল, তারা তেমনটি পারেনি।

আফসোসের কথা হলো, কুরআনের অনুবাদকে ক্রয় করা হয় শুধু রেওয়াজ হিসেবে বা বরকতের জন্য। এটিকে মূল্যবান জিনিস হিসেবে সুন্দর গিলাফে মুড়িয়ে আলমারির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রাখা হয়। তাদাব্বুর তো দূরে থাক; বরং পড়ার সময়ও নেই।

মুসলমানরা গল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়তে প্রচুর সময় ব্যয় করে। কিন্তু প্রতিদিন কমপক্ষে এক বা অর্ধেক রুকু পরিমাণ কুরআন বা কুরআনের অনুবাদ চিন্তা করে পড়ার সময় খুঁজে পায় না।

বর্তমানে মুসলমান সমাজে বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার, আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রফেসর, ইন্সপেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর, মন্ত্রী ও শিক্ষক। তাদের কথায় সাধারণ মুসলমানরা প্রভাবিত হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সাথে এই শিক্ষিত মহলের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। তাদেরকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে পারলে সমাজে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাই এই প্রভাবশালী শ্রেণিকে পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যের দিকে আবুত করতে হবে।

তিন.

অনেক সময়ই তাকলিদকে মুসলমানদের কুরআন-হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন বিবেচনা করা হয়।

মুসলমানদের অন্ধ অনুকরণ, সালাফিবাদের বোধগম্যতা ও অজ্ঞতার চূড়ান্ত বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে তারা যেন ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে ঘোষণা এবং পূর্ণ বিকাশ করতে পারে; যা সাহাবিদের ইসলাম ছিল।

চার.

চতুর সুফি, ফকির, ভণ্ড ও অহংকারীরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুসলমানদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে অত্যন্ত শক্তিশালী ফাঁদ পেতেছে। বিপুলসংখ্যক মুসলমান ব্যক্তিগত মর্যাদা অর্জনের প্রতি লালায়িত। মুসলমানদের এই ফাঁদ থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। তাদের এই লোভের লালাভরা পাথর অপসারণ করা জরুরি। তবেই না ইসলামের প্রকৃত পথের সন্ধান পাবে তারা।

পাঁচ.

মুসলমানদের মধ্যে যারা নামাজ, রোজার সম্পূর্ণ পাবন্দি করে এবং পরিপূর্ণ শরিয়াহ মেনে চলে, তাদের থেকে অনেক কল্যাণকর বিষয় প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কিন্তু এই মানুষগুলোও সাধারণভাবে এবং মানসিকভাবে সংকীর্ণতা ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত। তারা মুসলিম জাতির কল্যাণে তেমন ভূমিকা পালন করছে না। এর কারণ হচ্ছে, তারা পেশাদার আলিমদের নিয়ন্ত্রণে। তারা দলাদলি ও ধর্মান্ধতার লৌহ খাঁচায় আবদ্ধ।

তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা এই লোকদের বইপুস্তক পড়তে বাধ্য করেছে। তারা সুন্নাহর প্রতি উদাসীন এবং এটি তাদের বোধশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। ছোটো ছোটো শাখাগত কিছু সমস্যাকে বড়ো বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে; বাস্তবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দোকানদার ও পেশাদার মাওলানারা ফরজ, ওয়াজিব ও আকাইদের উসুলের গুরুত্বকে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও কলহের হাতিয়ার বানিয়ে রেখেছে এবং এই আগুনে ঘি ঢালার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে ন্যস্ত রেখেছে। এজন্য এই বেড়াজালও ভেঙে ফেলতে হবে।

আমি উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় দিকগুলো মাথায় রেখে সর্বপ্রথম এই বইটির খসড়া তৈরি করি এবং তা মাত্র অল্প কয়েক দিনেই সমাপ্ত করি। অপ্রয়োজনীয় বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা

করেছি। পুরো বছর বইটি লেখা শেষ করে অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করি। যে উদ্দেশ্যে এই বইটি লেখা হয়েছে, তা সামনে রেখে বারবার বইটি সম্পাদনা করা হয়েছে।

এই বইটির শেষ অধ্যায়ে বিবেচনা করা হয়েছে, যেন পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য পাঠকের হৃদয়ে ছায়া ফেলে। সেইসাথে শিক্ষিত যুবক-যুবতি এবং অন্য লোকদের পবিত্র কুরআন পাঠ ও অধ্যয়নে উৎসাহিত করে।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হবে, তা আমার অজানা নয়। তবে আমি হিংসা কিংবা আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। আর এটাও বলা জরুরি মনে করি, এই গ্রন্থে যা লিখেছি, তা মূলত ইসলামি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই লিখেছি; কারও ক্ষতি করতে নয়। আমি কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বইটি রচনা করেছি। আমার সমস্ত প্রত্যাশা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত।

আমি আশা করি, বইটি প্রকাশের ফলে সৃষ্ট হইচই সাময়িক এবং কয়েক দিনেই তা থেমে যাবে। আর অন্ধকারের শিশুরা ভবিষ্যতে নিশ্চিত হবে, সত্য কখনো চাপা থাকে না।

এই বইয়ের শুরুর দিকের কিছু অধ্যায় দেখে কেউ বলতে পারে, এইভাবে মুসলমানদের দোষত্রুটি প্রকাশ করা হেকমতের পরিপন্থি। তাদের জেনে রাখা উচিত, এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব। একই সঙ্গে তা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থিও বটে।

মুসলিম উম্মাহর যে বিশেষ দিকটি এ গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, তা উন্মোচন করা খুবই জরুরি। কেননা, এ সত্য গোপন থাকার কারণে মুসলমানদের অনেক বড়ো ক্ষতি হচ্ছে। এই ওষুধ তেতো হলেও এর ফল খুবই মিষ্টতা বয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ!

মুসলিম বিশ্বে ফিতনার সূচনা

মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ও বিভক্ত করেছে নানান ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ। এই ফিতনাগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়; এক. ভেতরগত, দুই. বাইরের ফিতনা। তবে বাস্তবতা হলো, এই প্রকারভেদ শুধু নামেই সীমাবদ্ধ। কারণ, এই ফিতনাগুলো ছিল মুনাফিক ও কাফিরদের তৈরি করা। ফলে এসব ফিতনার শেকড়ও ছিল অনেক গভীরে প্রোথিত। তাদের তৈরি করা ফিতনা এতটা ঠুনকো ছিল না যে, মুখের ফুঁ দিয়েই তা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব ছিল। এই সমস্ত ফিতনা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজ ফিতনার বেড়াজালে ফেঁসে গিয়েছিল খুব শক্তভাবে।

আবার যুগে যুগে মুসলিমরা যে যে ভুল কাজ করেছিল বা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার পেছনেও ছিল মুনাফিক ও কাফিরদের কলকাঠি। অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি, মুসলমানরা কোনো ভুল করলে এর পেছনের দৃশ্যপটে কাফির-মুনাফিকদের হাত ছিল।

মানুষ ও শয়তানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা ছিল আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আজও চলমান। নবিগণ এবং তাঁদের আদর্শের পথে চলা আদমসন্তান ও আলোর পতাকাবাহীরা এখনও সেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে নবিবিরোধীদের শয়তানের সন্তান এবং অন্ধকারের বাসিন্দা বলে আমাদের মনে করতে হবে। আর এই দুই দলের সংঘাত বহাল থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

অনেকেই বিশ্বাস করেন, কিয়ামতের আগে এক এমন যুগ আসবে, যেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। তখন কুফর ও ইসলাম অথবা অন্ধকার ও আলোর সংঘাত পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবারও ইসলামের সুবাস ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীজুড়ে। তবে এমন চিন্তার মানুষরা কিন্তু কুরআনের আয়াত এবং হাদিসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছেন। কারণ, কুরআনের কোনো একটি আয়াত থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, একসময় ইসলাম ছাড়া বাকি বাতিল ধর্মগুলো ধ্বংস হবে। আর তখন দুনিয়াতে কুফর ও ইসলামের সংঘাত পুরোপুরি সমাপ্ত হবে; বরং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

'আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি।'[১]

এই আয়াত থেকে বুঝতে পারি, অমুসলিম, মুনাফিক ও বিভ্রান্ত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটিই আল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য। কুরআনে আরও এসেছে, শয়তান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিল—

---

[১] সূরা মায়েদা : ১৪

فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ-

'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।'[২]

এই আয়াতও আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। ভবিষ্যদ্‌বাণী-সংবলিত হাদিসগুলোর ভান্ডারে যে জাল ও বানোয়াট হাদিসের আধিক্য রয়েছে, তা জ্ঞানীদের নিকট গোপন কিংবা অজানা কোনো বিষয় নয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ গবেষকরা ভালোভাবেই অবগত। কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যতের কোনো সংবাদ হাদিসে আসতে পারে, কিন্তু কুরআনবিরোধী কোনো সংবাদ তো রাসূল (সা.)-এর জবানে কখনোই আসতে পারে না।

এটা একটি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে ইসলামের ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠা খালি নেই। আর খালি থাকা উচিতও ছিল না। এত এত ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে যেতে হয়েছে, সেগুলোর কলেবর অবিশ্বাস্য। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা এর সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং পৃষ্ঠা খালি থাকবেই-বা কীভাবে? যাহোক আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো, কীভাবে মুসলিম উম্মাহের ভেতরে ফিতনার সূচনা হয়েছিল, তা বর্ণনা করা।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও মুখতার সাকাফি

রাসূল (সা.)-এর পর খলিফা হলেন আবু বরক সিদ্দিক (রা.)। এরপর অর্ধ জাহানের খলিফ আমিরুল মুমিনিন উমর (রা.)। তারপর খলিফ হলেন উসমান (রা.)। উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বাহ্যত শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। ৩০ হিজরি পর্যন্ত মুসলমানরা দুনিয়ার বড়ো বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিজয় করে নিজেদের নেতৃত্ব ও শাসনে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। সেটার বিস্তৃতি এতটাই বিশাল ছিল যে, অবশিষ্ট থাকা অন্ধকার পৃথিবী এই আলোকিত অংশের মোকাবিলায় কোনো গুরুত্ব বা মূল্য রাখত না।

সেই সময় ইসলামের দুনিয়াবি শক্তি চাইলেই বাকি পুরো পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিকে খুব সহজেই পরাজিত করতে পারত, কিন্তু তেমনটি হয়ে ওঠেনি। কারণ, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উত্তরসূরি ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সানআনি মুসলমানের বেশ ধরে। সে অন্য মুনাফিকদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসংখ্য নওমুসলিমকে ধোঁকা দেয়।

এই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সানআনি প্রথমে সুকৌশলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি বড়ো ফিতনা ঢুকিয়ে দেয়। সে ফিতনার নাম হলো—গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ ও বংশগত সাম্প্রদায়িকতা। অথচ এই দুটি বিষয়কে ইসলাম পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আবারও সেগুলোকে জীবিত ও জাগ্রত করে। আর মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়।

নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসাকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত বলেছেন। ইসলাম গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত করে বাপ-দাদার ক্ষতগুলো ভুলিয়ে মুসলমানদের এক জাতি বানিয়েছিল। তারা ছিল এক দেহের ন্যায়। তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর কালিমাকে উচ্চকিত করা।

---

[২] সূরা হিজর : ৩৬

এদিকে নতুন মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ তখনও কুরআন ও তার প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত ছিল না। তখনও তাদের মধ্যে পিতৃপুরুষের অন্ধ আনুগত্য এবং জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। মুনাফিকদের এই ফিতনা নববি যুগেও স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের মধ্যে ছিল। কিছুদিনের জন্য হলেও সেগুলোর প্রভাব গুটিকয়েক মুসলমানের ওপর পড়েছিল। সেই মৃতপ্রায় ফিতনা এই সময় এসে নওমুসলিমদের ওপর জেঁকে বসল।

নওমুসলিম ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। আর এই পার্থক্যের নাম ইসলাম ও রুহানিয়াত। নওমুসলিমরা ইসলাম ও রুহানিয়াত থেকে ছিল বেশ দূরে। সুতরাং তারা এই ফিতনায় সহজেই ফেঁসে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মদিনা, বসরা, কুফা, দামেশক, কাহেরাসহ সব কেন্দ্রীয় শহরে কিছুদিন অবস্থান করে। এসব এলাকায় কৌশল ও সাবধানতার সঙ্গে উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়।

তবে তার প্রচারণার ধরন ছিল একটু ভিন্ন। সে বলত, আলি (রা.) হলেন খিলাফতের প্রকৃত হকদার। সুতরাং তাঁর কাছেই খিলাফত আসা উচিত। এটা বলে বলে সে নওমুসলিমদের মধ্যে, বিশেষ করে বনু উমাইয়া ও বনু হাশেমের মধ্যে পুরোনো শত্রুতা ও গোত্রবাদকে উসকে দেয়।

এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এসব কলুষিত চিন্তাকে সুকৌশলে সে আবার জীবিত করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্টই বলেছেন—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

‘তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে। আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনগুলো স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পাও।’[৩]

রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে কুরাইশ ও আরবের নেতৃস্থানীয়দের বিশাল সমাবেশের উদ্দেশে বলেছিলেন—

‘হে কুরাইশ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের অহংকার এবং বাপ-দাদার গর্ব দূর করে দিয়েছেন। সব মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মধ্যে গোত্র ও

[৩] সূরা আলে ইমরান : ১০৩

কবিলা বানিয়েছি, যেন তোমাদের পরিচয় পৃথক পৃথক হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সম্মানিত, যে বেশি মুত্তাকি।'[৪]

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সর্বপ্রথম মদিনা মুনাওয়ারায় অর্থাৎ খিলাফতের রাজধানীতে নিজের ভয়াবহ মতাদর্শ বা ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার কপাল খারাপ বলতে হবে। কারণ, এখানে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সংখ্যায় অধিক। মদিনায় তাঁদের প্রভাবই ছিল বেশি। তাই সে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এখানে বরং তার এসব ধ্যানধারণা সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে হাশেমিরাই। তারা তাকে প্রত্যাখ্যানও করে।

মদিনা থেকে নিরাশ হয়ে সে পৌঁছল বসরায়। সেখানে ইরাকি ও ইরানি গোত্রগুলোর নওমুসলিমদের মধ্যে কিছুটা সফলতা পেল। সুতরাং এখানে নিজের সমমনা একটি দল তৈরির ফুরসত পায়। তারপর চলে যায় কুফায়। কুফার সেনাছাউনিতেও সব ধরনের মানুষ ছিল। সেখানেও সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি ফিতনাবাজ দল তৈরি করতে সক্ষম হলো।

তারপর সে কুফা থেকে চলে গেল দামেশকে। সেখানেও কিছুটা বিশৃঙ্খলা ছড়াল। কিন্তু শামের তৎকালীন শাসক মুয়াবিয়া (রা.) তার সম্পর্কে জেনে সচেতন হয়ে যান। তিনি দ্রুতই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। ফলে সে বেশি দিন সেখানে থাকতে পারল না।

তারপর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা গেল কাহেরায়। আর সেখানেই সে সফলতা পেল সবচেয়ে বেশি। এর পরিণতিতে বসরা ও কাহেরার ফিতনাবাজরা মিলে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করল। এরই ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা।

এই ফিতনা ৩০ থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত মুসলমানদের গোত্রীয় সংঘাতে ব্যস্ত রেখে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজের ক্ষতি করল অপূরণীয়। আর মুসলমানদের মধ্যে বংশীয় ও গোত্রীয় রেষারেষি নতুনভাবে তৈরি করে কুরআনে কারিমের দিকে তাদের মনোযোগ কমিয়ে দিলো। ফলে যে রজ্জুকে শক্ত করে ধরতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, তার বাঁধন হয়ে গেল হালকা, ঢিলে ও নাজুক।

হাসান (রা.) ৪১ হিজরিতে এই বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের খারাপ পরিণতি অনুভব করেন। ফলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সঙ্গীদের তৈরি করা ফিতনাকে সাহসিকতার সাথে রুখে দেন। এভাবে মুসলিম উম্মাহ আবারও এক কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এর পরের ২০ বছর নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করে। সেইসাথে স্থল ও জলপথে মুসলিমদের বিজয়াভিযানও অব্যাহত থাকে।

এরপর আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তেকাল, ইয়াজিদের ক্ষমতায় আরোহণ এবং কারবালার দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এতে ষড়যন্ত্রকারীরা একদিকে মুশরিকদের এবং অন্যদিকে মুনাফিকদের আবারও সাহস দিয়ে কুকর্মে ব্যস্ত করে তোলে। ফলে এবার যে ঝড় এলো, তাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও কাফিরদের খুব বেশি সফলতা আসেনি। কিন্তু মুনাফিকদের

---

[৪] ইবনে ইসহাক, *সিরাতে ইবনে ইসহাক*, খণ্ড-৪, পৃ. ৩১-৩২; ইবনে জারির তাবারি, *তারিখে তাবারি*, খণ্ড-৩, পৃ. ১২০

সংঘটিত ফিতনা প্রায় ১২-১৩ বছর অপূরণীয় ক্ষতি করে, যার ক্ষত ছিল অনেক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

প্রথম ঝড়, যা ৩০ থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত ১০ বছর স্থায়ী ছিল। তখন বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু পরের এই ঝড় চলে ৬১ থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত। তখন আর সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বেশি ছিল না। সে সময় কুরআনে কারিমের দিকে মুসলমানদের মনোযোগ কমে যায়। তারা জাগতিক মোহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই মুনাফিকরাও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কাজ করার সুযোগ পায় স্বাধীনভাবে।

সে সময় মুসলমানরা খানায়ে কাবার অসম্মানকে নিজের প্রতিশোধস্পৃহার সামনে উপেক্ষা করে। শুধু তা-ই নয়, তারা বরং আবদুল্লাহ ইবনে সাবার উত্তরসূরি মুখতার মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দা সাকাফির মুশরিকি শিক্ষা এবং কুফরি দাবিকেও ইসলামের অংশ মনে করে। সুলায়মান ইবনে সারদ হাশেমি ও শিআরে আলিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে আইনুল ওয়ারদা যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান নিহত হলো মুসলমানদের হাতেই।

এই উল্লিখিত মুখতার সাকাফির কৃতকর্ম কী ছিল জানেন? সে হুসাইন (রা.)-এর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে ধোঁকা দিয়ে কুফায় নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত এবং কারবালার ঘটনার হৃদয়বিদারক স্মৃতিকে মাধ্যম বানিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গোপন ফিতনাকে সজীব করে তোলে।

এই ফিতনার একটি ধাপ ছিল গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতাকে জীবন্ত করা। এভাবে সে নিজের বিপুল শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। তারপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুফার শাসনক্ষমতা আলাবিদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের মুশরিক বানানো শুরু করে।

মুখতার সাকাফি খুব চালাকির সাথে কুফাবাসীকে নিজের কারামত ও অস্বাভাবিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায়। কুফাবাসীর সাহায্যে কুফার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে নিজে কুফার শাসক বনে যায়।

আলি (রা.) যখন কুফায় অবস্থান করতেন, সেখানে তাঁর একটি চেয়ার ছিল। তিনি বেশির ভাগ সময় এটির ওপর বসতেন। ওই চেয়ার তাঁর ভাতিজাপুত্র ইবনে উম্মে হানি বিনতে আবু তালিবের কাছে ছিল। মুখতার তার কাছে চেয়ারটি চায়। কিন্তু তিনি ওই চেয়ার না দিয়ে একই রকম আরেকটি চেয়ার দেন। মুখতার ওই চেয়ার সামনে রেখে দুই রাকাত নামাজ পড়ে। তারপর তা চুম্বন করে।

এরপর সে তার বাহিনীর সৈন্যদের একত্রিত করে। তাদের বলে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাবুতে সাকিনাকে বনি ইসরাইলের সাহায্য ও বরকতের কারণ বানিয়েছিলেন, একইভাবে এই চেয়ারকেও শিআরে আলি (রা.)-এর নিশানি বানিয়েছেন। ফলে এখন আমরা সব জায়গায় বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হব। তাই আমাদের উচিত এই চেয়ারকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া।

তার কথা শুনে লোকেরা ওই চেয়ারে চুম্বন করে। এমনকি এটির সামনে সিজদাও করে। মুখতার একটি সিন্দুক অত্যন্ত সুন্দর করে সাজিয়ে ওই চেয়ারের ওপর রাখে। সিন্দুকটির মধ্যে লাগানো হলো রুপার তালা। এরপর কুফার জামে মসজিদে এটি রেখে দেয় এবং এর নিরাপত্তা দিতে

একজন সেনা মোতায়েন করে। মসজিদে আসা মুসল্লিদের নামাজ শেষে ওই চেয়ারকে চুম্বন করা বাধ্যতামূলক করে দেয়।

মুখতার পর্যায়ক্রমে নিজের ইলহাম ও ওহির কথা মানুষকে বলা শুরু করল। এরপর জনগণের কাছে নিজের নবি হওয়ার স্বীকারোক্তি নিতে লাগল।

অতঃপর আলি (রা.)-এর জামাতা মুসআব ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর হাতে এই মুখতার মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া কুফায় পরাজিত ও নিহত হয়। মুসআব ইবনে জুবায়ের (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ভাই। ঘটনাটি ছিল ৬৭ হিজরির ১৪ রমজান।

ভেবে দেখার বিষয় হলো, তখনও বেশ কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মুখতাব মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দা সাকাফি কুফাবাসীকে কীভাবে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে!

কুফার পুরো জনবসতি সৈন্য এবং বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ভাগ করা ছিল। এর একটি অংশ ছিল ইয়েমেন, হাজরামাউত, হেজাজ। আরবরা ছিল এই অংশের বাসিন্দা। এই আরবরা ইরানের অগ্নিপূজারি সাম্রাজ্যে পতনের পর মুসলমান হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মদিনায় এসেছিল। কিন্তু তাদের মদিনায় না রেখে ইরানের সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কুফায় ইরাকি আরবের কিছু গোত্র ছিল। পূর্বে তারা ছিল ইরানি সাম্রাজ্যের অধীন। এই ইরাকি আরবরা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামি বাহিনীতে শামিল হয়। তাদের কখনো মদিনায় যাওয়ার সুযোগই হয়নি।

এ ছাড়া কুফায় কিছু ইরানির বসবাস ছিল। ইরান বিজিত হওয়ার পর তারা কুফার একটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এই এলাকাটি খুব দ্রুত একটি শহরে রূপ নেয়।

কুফায় সাহাবায়ে কেরাম ও আলিমদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম; একেবারেই নামমাত্র। বিজয় ও বিলাসসামগ্রীর আধিক্যের কারণে কুফা কেন্দ্রীয় শহর হয়ে ওঠে। এজন্য এখানে অবস্থানরত সৈন্যদের কুফার স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা পানিশূন্য মরু অঞ্চল এবং অখ্যাত বসতিতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা বাদ দেয়।

তাদের প্রথম প্রজন্মের একটি বড়ো অংশকে কোনোভাবেই ইসলামি শিক্ষার পরিপূর্ণ আলিম বলা যায় না। কারণ, তাদের পুরো জীবন কেটেছে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে। আর তারা জাহেলিয়াতের আবেগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল না। উপরন্তু ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজারিদের অনেকেই কুরাইশ ও আরবদের সাথে গোত্রগত বিরোধ পোষণ করত। তারাও ইসলামের শান-শওকতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল পাক্কা মুনাফিক। ফলে মুসলমানদের ক্ষতি করতে তারা সব সময় সুযোগ খুঁজে বেড়াত। এজন্য কুফাই ছিল তাদের সবচেয়ে উত্তম জায়গা। এখানেই তারা নিরাপদে কাজ করতে পারত।

এই লোকেরা কোনো সময়ই নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত হতো না। মুনাফিক আবু জায়েদ ঈসায়ি মুখতারের ক্ষমতা দখলের কিছুকাল আগে এক মুসলমান (মুনাফিক) গভর্নরের সভাসদদের অন্তর্ভুক্ত হয়। সে গভর্নরের আস্থা অর্জনের পর তাকে মদ্যপানের উৎসাহ দেয়। ইতিহাসের বিভিন্ন

গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। আর গৃহযুদ্ধের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী নতুন প্রজন্ম কুফার উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছিল না।

উসমান (রা.)-এর শাহাদাত, আলি ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর দ্বন্দ্ব, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিন যুদ্ধ, খারেজিদের বিশৃঙ্খলা, আলি (রা.)-এর শাহাদাত, কারবালার ঘটনা ইত্যাদি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নীলনকশা। তার ফিতনার পরিণতিতেই একের পর এক এমন খারাপ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আর কুফাবাসীর সাথে ওইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

কুফার জনসাধারণ তো বটেই, মক্কা ও মদিনার বিশেষ ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করেছিল উল্লিখিত ঘটনাগুলো। সাহাবায়ে কেরামের যে দল এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেকে আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। ইসলাম প্রচারে এবং কুরআন শিক্ষা দিতে যারা ব্যস্ত থেকেছেন, এই সমস্ত ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা তাঁদের কাজকেও কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল।

মোটকথা, কুফাবাসী যে মুখতারের ধোঁকায় পড়েছিল, এর অন্যতম কারণ হলো কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে গাফেল এবং ইসলামি জ্ঞানে অপূর্ণতা। এর কিছুদিন পরই কুফাবাসী ইলম হাসিল এবং কুরআনের দিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেল। ফলে তখন তাদের মাঝে গড়ে উঠল বড়ো বড়ো আলিম ও প্রসিদ্ধ ইমাম।

আমি এই জায়গায় মুখতারের বিভ্রান্তি ও কুফাবাসীর ভুল কাজকর্মের ফিরিস্তি দেওয়া জরুরি মনে করেছি একটি কারণে। তা হলো—আমাদের সময়ের লোকেরা সব সময় বাপ-দাদা এবং নিজেদের পূর্ববর্তীদের নামের ওপর জীবন উৎসর্গ করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। নিজের পূর্ববর্তীদের কোনো ভুল মেনে নিতে চায় না। ভেবে দেখুন, নববি যুগের এত নিকটবর্তী সময়ের মানুষও ইসলাম থেকে গাফেল হয়ে কত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ করতে পারে। আর তারা মুনাফিকদের হাতে কীভাবে খেলনার পুতুল হয়ে যায়।

মানুষ আজকাল নিজেদের এবং বাপ-দাদাদের শুধু পুরোনো মানুষ হওয়ার কারণে ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করে। তাদের শরিয়াহবিরোধী কাজগুলোকে মনে করে ভালো ও উত্তম কাজ। এবার লোকেরা একটু চিন্তা করে দেখুক, কুফার মানুষরা ছিল আমাদের তুলনায় অনেক বেশি নববি যুগের কাছাকাছি। তারা যদি ফিতনায় পড়ে যায় এবং মুখতারকে নবি মানতে পারে, তাহলে আমরা কতটা ঝুঁকিমুক্ত। এখনকার দিনের মুখতারের কোনো চিন্তা বা আকিদা কি ইসলামের অংশ হতে পারে?

মুনাফিকদের ধারাবাহিক চক্রান্ত

ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সমর্থিত দলটির কিছু কার্যকলাপ তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি—

- এই দলটি বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রগত বিরোধকে জাগ্রত করেছে। এরপর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন অনৈক্য ও দলাদলি তৈরি করার পর নিজের পক্ষে একটি পোক্ত দল বানিয়ে নিয়েছে।
- এই দলের লোকজন উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আলি (রা.)-কে সাহায্য ও সমর্থনের ঘোষণা দেয়। এরপর তাঁর হাতে বাইয়াত নিয়ে তাঁরই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তারা আলি (রা.)-এর আনুগত্য ও নির্দেশ কখনোই বাস্তবায়ন করেনি।

- এই দলটি সব সময় সুযোগ বুঝে আলি (রা.)-কে ধোঁকা দিয়েছে। তাঁর কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছে নানাভাবে।
- তারা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আলি (রা.)-কে অনেক ব্যস্ত রাখে। এর ফলে তিনি উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের ধরতে পারেননি; বিচারও করতে পারেননি।
- আবার এই দলটিই খলিফাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ দেয়নি।
- এই দলই সিফফিনের যুদ্ধের সময় আলি (রা.)-কে সফলতা অর্জন করতে বাধা দিয়েছে।
- তারপর এই দলই আবার যুদ্ধ মুলতবি করতে তাঁকে বাধ্য করেছে।
- আবার এই দলই আলি (রা.)-এর ওপর যুদ্ধ মুলতবি করার অভিযোগ আরোপ করে মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছে।
- এই দলই খারেজি নাম ধারণ করে আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর সর্বশেষে তাঁর শাহাদতেরও কারণ হয়েছে।
- তারপর এই দলই হাসান (রা.)-এর বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।
- এই দলই কুফা ও বসরা ইত্যাদি সেনানিবাসকে নিজেদের ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং ইরাক ও পারস্যকে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা বানিয়ে উমাইয়া ও হাশেমিদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে প্রস্তুত করেছে ধারাবাহিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র। ফলে উমাইয়ারা সফল হয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য হাশেমিদের ময়দান থেকে বের করে দিয়েছে। সেইসাথে ব্যস্ত হয়েছে দ্রুত বিজয়াভিযানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে।

আলি (রা.)-এর লড়াই এবং তাঁর খিলাফতকালের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার প্রকৃত কারণ কী ছিল—খুব কম লোকই সেদিকে মনোযোগ দেয়। মুনাফিকদের এই শক্তিশালী দলের আনুগত্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার সাজানো নীতির ওপর।

মুনাফিকদের এই দলও উমাইয়াদের প্রতাপ ও শক্তির মোকাবিলায় নিজেদের প্রকাশ্য দুষ্কর্ম থেকে বিরত থেকে গোপন কার্যক্রম শুরু করে। উমাইয়ারা এই দলকে নিজেদের একটি বড়ো ভুলের কারণে গোপন কার্যক্রম চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল।

উমাইয়াদের সেই ভুল ছিল ক্ষমার অযোগ্য। তারা খিলাফত ও ইসলামি নেতৃত্বকে একটি বিশেষ গোত্রের জন্য বিশেষায়িত ও সম্পর্কিত করে নিজেদের সন্তানদের পরবর্তী খলিফা বানানোর কুপ্রথা চালু করেছিল। আর এটাই মুনাফিকদের কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর ফলে হাশেমিদের অন্তরে আরও বেশি প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি হয়।

হাশেমিরা অসফল হয়ে এবং অধিকাংশ আরব গোত্রকে উমাইয়াদের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী হতে দেখে নিজেদের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহার সৃষ্টি করে। তারা এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলকে নিজেদের কাজের হাতিয়ার বানায়। আর আরবদের জায়গায় ইরানিদের কাজে লাগানো জরুরি মনে করে।

একদিকে বনু উমাইয়া নিশ্চিন্ত হয়ে বিজয়াভিযানের দিকে মনোযোগ দেয়, অন্যদিকে বনু হাশেম নিজেদের গোপন দল তৈরি এবং খিলাফতে বনু উমাইয়ার পতন ঘটনানোর উপায় খুঁজতে থাকে।

৭৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খিলাফত শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাহ্যত মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজেও একজন আলিম এবং অনেক সাহাবির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে মদিনা, মক্কা, দামেশক এবং অন্য কেন্দ্রীয় শহরগুলোতেও কোনো না কোনো সাহাবি ছিলেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের একটি দল ইলমে দ্বীন অর্জনে এবং অন্য দলগুলো বিভিন্ন শহর ও রাজত্ব বিজয় করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের পর ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক, তার পর সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক, তার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ, তার পর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক এবং তার পর হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ক্ষমতায় আরোহণ করেন। হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ১২৫ হিজরিতে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

উমাইয়াদের এই ছয় খলিফার মোট সময়কাল ছিল ৫০ বছর। এই ৫০ বছরে মুসলমানদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সব রকম উন্নতি হয়েছে। এই সময়ই আন্দালুস ও মরক্কো থেকে নিয়ে সিন্ধু, বলখ ও চীন পর্যন্ত প্রায় পুরো সভ্য পৃথিবী মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

উমাইয়াদের এই ৫০ বছরের খিলাফত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আজ পর্যন্ত পুরো সময়ের চেয়ে উত্তম ছিল। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও শান-শওকতের জন্য ছিল সোনালি সময়। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কল্যাণ ও বরকতের দিক থেকে খিলাফতে রাশেদার প্রথম ২৫ বছরের সাথে এই উমাইয়াদের সময় কোনোভাবেই তুলনীয় হতে পারে না।

এই যুগ শেষ হওয়ার মাধ্যমে প্রথমত সব সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের শিষ্যরা অর্থাৎ তাবেয়িরা তাঁদের স্থান দখল করে। অর্থাৎ তাবেয়িগণও দ্বীনের শিক্ষা ও হেফাজতের কাজে অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদেরও বেশির ভাগ এই সময়ের মধ্যেই বিদায় নিলে স্থলাভিষিক্ত হন তাবে-তাবেয়িগণ।

কিন্তু ইসলামের এই অগ্রগতি ও বিজয়ের যুগও মুনাফিকদের ওই জ্বালানো আগুন গোত্র ও বংশীয় প্রতিহিংসাকে সজাগ করে দিয়েছিল। আর তা ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল সব সময়ই। খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের পর কিছু বছরের মধ্যেই এই আগুনের শিখা আরও বাড়তে থাকে। এই লেলিহান শিখা শুধু বনু উমাইয়ার খিলাফতকেই ধ্বংস করে হাশেমিদের আব্বাসীয় খান্দানকে খিলাফতে তখতে বসায়নি; তারা বরং ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় শাসনকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে। আর ইসলামের সরল-সহজ বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ছিদ্র তৈরি করতে সফল হয়। এর ফলে জন্ম নেয় অনেকগুলো গোষ্ঠী ও জামাতের।